"If we behave like those on the other side, then we *are* the other side. Instead of changing the world, all we'll achieve is a reflection of the one we want to destroy."
- Jean Genet

_____প্রবন্ধ_____

সখা ও শামশেরঃ একটি স্বরূপ বন্ধুর খোঁজে

রমিত দে

কবি কি কেবল নিজেরই প্রেমে পড়েন ! নার্সিসিস্ট ! আত্মঋণ চুকোতে উচ্চারণ করেন - "আমি আপনার মাঝে আপনি হারা/ আপন সৌরভে সারা/ যেন আপনার মন/ আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি"! নাকি রক্তমাংসের টানাপোড়েনে কালকর্তিত কল্পনার থেকে তাকেও বেরিয়ে আসতে দেখি আমরা ! নাহলে কেন শামশের আনোয়ার "ক্ষুধা" কবিতায় বলে ওঠেন- " তুমি কি অন্তত একবার সৎ, প্রফুল্ল বৃষ্টি হয়ে/ আমার শরীরের ওপর ঝরতে পারো না?/ .....ঢুকিয়ে দাও এই ক্ষুধিত বুকের ভিতর তোমার/ মুখ সম্পূর্ণ, সবটা ঢুকিয়ে দাও।"- কি এই ক্ষুধা ! যার জন্য জীবনকে হঠাৎ খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়, যার জন্য কবি খুঁজতে বেরোন শুভময় সখ্য! প্রথমেই দেখা যাক শামশেরের কাব্যের মূল অনুরণনটি। মাত্র তিনটি বই আর তিনটি বইয়ের অধিকাংশেই ছড়ানো রাগ রক্ত আর রাতের পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সেখানে বেরিয়ে পড়ছে রুগ্ন ঘেয়ো মূর্খ স্বপ্নের আবহ।
শামশেরের ভাষা কিন্তু অবাকনির্জণ কোনো ভাষা নয়, সেখানে অমৃতত্বের সাধনা নেই। সত্তরের মহাসময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বপ্নের নির্বাচনে কোনো আলোকের উত্তরাধিকারীকে নয় বরং আমরা পাচ্ছি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া একটি নিরঞ্জনশূন্য অন্ধকারের মুখ; সেখানে কালো টায়ারের বৃষ্টি, অম্বল ও ধাতুদৌর্বল্যের বৃষ্টি, সেখানে নিদ্রাহীন ঝাঁট দেওয়া মেঘের বাড়ি। তাঁর স্বপ্নের সারাটা শহর যেন জীবন থেকে সরাসরি উঠে এসে বাস্তবের প্রান্তে এসে সারা রাত একা জেগে থাকে জীর্ণ আকাঙ্খার স্তুপ নিয়ে, খুঁজে বেড়ায় সেই মানুষগুলোকে যাদের ঘোলাটে সাদা জিভ

চেটে দিচ্ছে কবির শরীর, থলথলে চর্বি বন্ধ করে দিচ্ছে কবির নিঃশ্বাস। কিন্তু একধরনের অশনায়া পিপিসাও শামশেরের চোখে, তাঁর ধূসর চোখদুটো যেন অসহায়ভাবে বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তগূঢ় আত্মার প্রেষনায়। সমাজ সচেতন কবি শামশের, অথচ তাঁর প্রতীত সময়ের মাঝে তাঁর গভীর নির্জন ব্যক্তিগত প্রণয় অবহেলিত হয়নি কবিতার ভাষায়। আসলে একটা সময় আসে কবি যখন কারু নন। কৃষিকুঞ্জ গরুগাভিগোয়ালের শরীর ছিঁড়ে তার ভঙ্গি তখন বেপরোয়া। অন্ধকার অন্ধকার তবু তিনি বেঁচে আছেন, অন্ধকার অন্ধকার তবু তিনি দুঃসহ জীবনের বমন ধুচ্ছেন । আন্তিগোনের মত শাসন মানছেন না, বিদ্রোহ করছেন, দেশান্তরে পাতালপুরীতে নির্বাসিত মাথাগুলোর মাঝে আলো ফেলে দেখতে চেষ্টা করছেন তিনি আসলে কে ! তিনি আসলে কে ? সফোক্লেসের আন্তিগোনের মত তিনি কি স্মরণ করাচ্ছেন - "I have been a stranger here in my own land/ all my life/ The blasphemy of my birth has followed me." নাকি শামশের বহন করছেন অন্য এক শামশেরকে, তাঁর অলটার ইগোকে ! বারবার আঙুল তুলে বোঝাবার চেষ্টা করছেন- "You are alive, but I belong to death"। –"অলটার ইগো' নামের কবিতায় এক বন্দী শামশেরকে দেখা যাচ্ছে, যে কিনা পরাভূত হয়ে রয়েছে অন্য এক পুরুষে।– " আমি তাকে চশমার উলটো দিক ও বাঘের হাঁ এর ওপাশ থেকে দেখতে পাই, তাকে মানে শামশেরকে, আমি কখনো সোজা কি মুখোমুখি হাঁটতে দেখি না। খুব গোলমেলে জায়গায়, একেবারেই প্রত্যাশা করছি না যখন হঠাৎ তার ছায়া বা পিঠের খানিকটা চোখে পড়ে। আমি ঝর্ণার পাশে থাকলে সে বালুর গর্ভের কাছাকাছি চলে যায়। বালুর গর্ভের কাছাকাছি গেলে সে ঝর্ণার পাশে ।.....আমি খাদের নীচে থাকলে সে চড়াই এর ওপর থেকে টুকি দ্যায়, যখন চড়াই দিয়ে হাঁটি, সে খাদের নিচে ঘুমিয়ে থাকে। আমি তাকে অসমান কাঁচা বা গরিলার কালো মাড়ির ওপাশ থেকে দেখতে পাই ..... মানে শামশেরকে, আমি কখনো সোজা কি মুখোমুখি হাঁটতে দেখি না ।"- কিন্তু না এ পর্যন্ত এসে আমরা যদি ভেবে ফেলি একজন কবিকে আবিষ্কার করে ফেললাম, তার কবিতার কাটা ফসলগুলোকে আমাদের কুসুমঘুমে তুলে নিতে পারলাম তবে হয়ত সবটা মেলে না। একটা পারসেপটেড দূরত্ব থেকে যায়।

'অলটার ইগো' শামশেরেরও ছিল। ঠিক যেমন সবার থাকে। শিস দিয়ে ওঠে। লেজ আর একটু লম্বা করে নাচে। "মূর্খ স্বপ্নের গান" বা "শিকল আমার গায়ের গন্ধে" কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে শামশেরের যে জং ঝুরঝুর মুখটা খোয়া যাচ্ছিল বারবার তাকে কিন্তু কোনো নদীর ধারে, কোনো লাল চাদরে কোনো অন্ধ কুয়োর অন্ধত্বেই কেবল খোঁজ করেননি শামশের। বারবার ফিরে ফিরে এসেছেন প্রেমিকার চুম্বনের দাগ, ব্রণ, নিঃশ্বাস ও চোখের দেয়াল ভাঙতে। জীবনের ঘোড়ালো সিঁড়ি বেয়ে বারবার নেমে এসেছেন মায়ের স্নিগ্ধ নিশিঘুমে। যাপনের অসম পংক্তিগুলির মাঝে এক শামশেরকে পাওয়া গেলেও যেন তাঁর "প্রকৃত কঙ্কাল" পোঁতা আছে মা আর প্রেয়সীর ওই অবলীন জাদুঘরে। যে 'অলটার ইগো' কে তিনি খুঁজছেন যাবজ্জীবন নির্বাসনের যাপনে তার ভেতরের রোদ্দুর আর বরফের টুকরোগুলোকে সরালেই দেখা যাবে সেই প্রকৃত ঘর। এখানেই কবির পুর্নবাসন। শামশের যখন তাঁর 'মাতৃবন্দনা' কবিতায় উচ্চারণ করেন - "আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কাছে আমার পরাজয় চিরকালের" তখন পোলিশ কবি তাজেউস রজেভিচের কথা মনে পড়ে যিনি জীবনের সংকটকে কবিতার আধান করেও বাবার নস্টালজিক হয়ে উঠেছেন স্মৃতির কাছে, ফেলে আসা সামান্যের কাছে। "মাদার ডিপার্টস (Mother Departs) বইয়ের "Return to the woods" কবিতায় যে ফেরার তাড়না, অসংখ্য আঘাতের শেষে সমস্ত দিকের জানলাগুলো যে একটি একটি করে খুলে দেওয়ার স্পর্ধা, যেখান থেকে রজেভিচ লেখেন - "When I close my eyes I sense A bird's call the creak of pines/ The wood's shallow silence Ruffled by our laughter/ I see the wood where/ We picked berries together/ Our bodies then were as bubbling And young as the waters/ We rushed back home/ Bare feet like wings fly/ And shine in the dust/ Our mouths black from berries/ Now you can see the house. Smoke in the sky creeping patiently/ And mother in the window/….Her hand shielding her eyes a small house"- জীবনের অপরূপ স্বাদের কাছে এসে মনে পড়ে যায় রজেভিচের সেই কথা-আসলে যিনি কবিতা লেখেন তিনি যেমন পায়ের বেড়ি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেন তেমনি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতেও ভালোবাসেন। আর পানার

জঙ্গলে পড়ে থাকা বেপোরয়া ও অতি উদ্দাম শামশেরের বাইরেও যেন এমনই এক ‘‘অতিপ্রিয় স্বর্গীয় বালক’’ যিনি বিনীত ও নতজানু হচ্ছেন মা কিংবা প্রেয়সীর কাছে, দৌড়ে যাওয়া এবং চাপ চাপ ভালবাসাহীনতার মাঝে সর্মপণ ও বেদনার ভাষা ছড়িয়ে দিচ্ছেন কোনো এক নারীর কোলে এসে। চটচটে পৃথিবী আর রক্তপাতের রিকুইজিশন ছিঁড়ে এখানেই শামশেরকে ফিরে আসতে দেখি মা কিংবা প্রেমিকার স্তনের কাছে, যেন ডুবন্ত সূর্যের আঁচ নিয়ে ওখানেই রয়েছে সীমাহীন নীড়; তাই তো কখনো মায়ের প্রতি তাঁর অফ ভয়েস বলে ওঠে- ‘‘তোমার স্তনে আঘাত ছিলনা/ কোমলতা ছিল, আশীর্বাদ ছিলো/ আমি কতদিন তোমার স্তনের মতো দুটি সেবাপরায়ন / স্তন খুঁজেছি’’ আবার কখনও প্রেমিকার দিকে তাঁর ক্যামেরা প্যান করিয়ে শামশের খোঁজেন ভালোবাসার সন্ধ্যাভাষা, বেঁচে থাকার আশ্চর্য্য ডায়ালেকটিক - ‘‘তোমার স্তনে হাত রাখলে মনে হয় যে একটা/ছোট্ট পাখি চেপে ধরেছি মুঠোর ভিতর;/ জোরে চেপে ধরলেই মরে যাবে- / আঙুলের ডগা বুলিয়ে বুলিয়ে আমি তোমার/ স্তনের পালকগুলো খাড়া করে তুলি।/ স্তনের ঠোঁটের মুখে গুঁজে দিই মমতার ক্ষুদ এবং কুঁড়ো,/ তখন খুশিতে ডাকতে শুরু করে তোমার স্তনদুটো- / ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ায় আমার মুখ, কপাল, বুক/ এবং ঘাড়ের ওপর’’-

‘‘দেজ’’ থেকে প্রকাশিত শামশের আনোয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় ভাস্কর চক্রবর্তী লিখছেন - ‘‘মা আর প্রেমিকার এক মিশ্রিত বন্ধনে শামশের এক দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন ছিলো’’। তাঁর কবিতার কাছে ফিরে ফিরে এলে খানিকক্ষন চুপ করে আমাদের বসে থাকতে হয় শামশেরের এই অতিপ্রিয় দুই স্তনের কাছাকাছি ; ‘জীবন ও মৃত্যুর মাঝের এই কি সেই আন্তর্জাতিক রেখা’ যেখানে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন শামশের বারবার বিলুপ্তির আগে ! আসলে কেবল ‘কবিতার শিকলের ভীম আঁটুনিতে তো থাকতে পারেননা একজন মানুষ, তাকে তো ফিরে ফিরে আসতেই হবে তার ধ্বংসাবশেষ নিয়ে। শিকল আর শিকলের জড়তা যেখানে অন্ধকার দাঁড়িয়ে রয়েছে আর যেখানে দাঁড়িয়ে শামশের উচ্চারন করছেন-

‘‘ শিকল আমাকে খুঁজছেঃ শুধু দাঁড়িয়ে থাকা . . .
উপায়হীন দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই
শিকল আমার গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
এগিয়ে আসছে- আগুনও আমার শরীরের
গন্ধ পেয়ে লোভী, হিংস্র ছুটে আসছে-
গাছগুলো দৌড়চ্ছে এখনো জীবন্ত, এখনো
টাটকা রয়ে গেছে এমন এক মানুষের সন্ধান পেয়ে- ’’

সেখানে আসলে অলক্ষ্যেই একজন মানুষ ভেঙ্গে যাচ্ছেন নিজেরই ‘আমি’তে, এপাশ ওপাশ করছেন, কাঁটা নিয়ে ছটফট করছেন, আক্রান্ত সময় পেরিয়ে খুঁজছেন এক স্থায়ী আত্মসমপর্ণ। আসলে শামশেরের বলার মধ্যে রয়েছে একধরনের বিভ্রম, অন্ধকারের কথা বলতে বলতে, চ্যুত জীবনের সুরম্য মীমাংসা চাইতে চাইতে কখন যেন নিজেই অন্ধকার হয়ে উঠছেন, হেরে যাচ্ছেন শামসের, নিজেরই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে খুঁজে ফিরছেন একটি ‘‘টাটকা মানুষ’’। ‘‘A man who disintegrated and dissolved into the infinity of his darkness, himself becoming infinite. But the larger a man grows in his own inner darkness, the more his outer form diminishes. A man with closed eyes is a wreck of a man.’’- শামশেরও যেন তাঁর বাইরের সীমাহীন অন্ধকারকে, নির্বাসিত বাজারকে পেরোতে পেরোতে ঢুকে পড়ছেন ভেতরের বন্দরে, তুলে নিচ্ছেন সেই নিমজ্জিত নোঙর যেখানে পোঁতা রয়েছে চূর্ণ চূর্ণ কতকগুলো ব্যক্তিমানুষের জগত, চূর্ণ চূর্ণ অমীমাংসিত কিছু আবর্ত।

যেকোনো সৃষ্টির মূলেই থাকে স্রষ্টার সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা অনুভূতি আর আকাঙ্খা মিশ্রিত জীবনের মাধুকরী

অথচ এরই পাশাপাশি গড়ে ওঠে ‘আমি’ থেকে একধরনের উত্তোরণ, একধরনের নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠা। নির্মম প্রবহমানের সাথে কবি তখন এগিয়ে যান আর পেছনে পড়ে থাকে তার ব্যক্তিক ‘আমি’টুকু। আর এরপর কবিতায় উঠে এল যে ‘আমি’ সে তো সমাজের ছায়া ধরে ধরে আলো খুঁজতে বেরানো একটা সময়ের ইতিহাস, শ্রোতার জায়গায় বসে থাকে সে, লক্ষ্য করে আশেপাশের সূর্যাস্তে কিভাবে সুরকি ভাঙতে শুরু করেছে সম্পর্কের মানুষ, কিভাবে আঁচড় কাটতেই নখ থ্যাঁতলা হয়ে যাচ্ছে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কের। কবি এখানে তার নগ্ন কাঠামোর থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন এবার, চেষ্টা করবেন বড় মাপের একটা মানুষকে শনাক্ত করতে এবং শামশেরও কি শব্দ বর্ণের খন্ড কোলাজে বিস্তীর্ণ এই ‘আমি’কে খুঁজলেন ! কিংবা নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন একাধিক আমিকে ! নিজেকেই যেন অতিক্রম করতে চাইছেন শামশের। টুকরো টুকরো করে ভেতরের দ্বন্ধযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে অবয়বদের আয়তন ধরে ধরে পৌঁছতে চাইছেন আত্মার ইক্ষায়।–

“ আজ আমি খুরপি নিয়ে শুয়েছি
কোপাবো নিজেকে
মাটিতে গড়াবে শামশেরের বীজ . . .
জন্মাবে আরো অনেক হাজার শামশের
যে শামশেরের জিভ লম্বা হয়ে ঠেকেছে
পায়ের কাছে
আর যার চোখের পাতা রক্তের সমুদ্রে ভিজে আছে
কপাল থেকে যার আছাড় খেয়ে পড়ে বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ
. . . . . .
. . . . . .
জন্মাবে আরো অনেক হাজার শামশের
. . . . . .
জন্মাবে সেই পৌরানিক কষ্ট- বিদ্ধ শামশের আরো
হাজার শামশের হয়ে জন্মাবে
বিষ- ফুলের লতা জড়ানো থাকবে তাদের গায়ে
রোজ সকালে লতার শরীর ছিঁড়ে গজাবে ফুল
অদ্ভুত ফুল, দস্তুর কুকুরের মতো ওরা ডাকবে-
হাজার হাজার নতুন শামশেরকে . . . ”

স্ব এর এই খোঁজ তো কবির স্বাভাবিক, তার অন্বেষায় আত্মযোগ তো অচ্ছেদ্য। কবি তো কিছুতেই তৃপ্ত হন না, নোঙর বাঁধতে চান না। তার কল্পনার যে মুক্তি নেই, যাপিত উপলব্ধির ভেতর পড়ে থাকে অযাপিত কিছু আর্তি কিছু অভাব। তিনটি মাত্র কবিতার বই নিয়ে শামশেরও তো আজীবন ছুটে গেছেন তাঁর ছায়ার পেছন পেছন অতিকায় আলোটি পেতে। ঠিক এখানে এসে মনে পড়ে যাচ্ছে বাদল সরকারের “বীজ” নাটকের সেই মেয়ে আর দৈত্যের কথোপকথনটি। যেখানে বুর্জোয়া সমাজে কেবল গ্লাস ভাঙার শব্দ, মানুষ ভাঙার শব্দ। “ওঠো- খাও- কাজে যাও- ফিরে এসো- ঘুমাও” এর মত থলথলে সমাজের দৈত্যের হাত থেকে বাঁচতে সেখানে বাদল সরকারের খোঁজ কেবল একটি ‘বাঁচার’ নান্দনিক বর্গ। সংলাপে দৈত্য যখন বলছে - “সে ? কে সে ? কোথায় সে ? কেমন সে ?”, তার প্রতুত্তরে মেয়েকে আমরা বলতে শুনি - “সে বীজ/ একটা বীজ/ মাটির নিচে/ বাইরে আসবে/একদিন আসবে”। দৈত্য তার সঙ্গীদের বলে - “খোঁজো তাকে/ খুঁজে বার করো/ নষ্ট করো তাকে/ ধ্বংস করো” আর প্রসেনিয়াম মঞ্চে দাঁড়িয়ে অর্থহীন শূন্য পরিবেশের নিয়ন্ত্রিত নাগাল থেকে বেরোতে স্বপ্ন দেখছে মেয়েটি, স্বপ্ন দেখছে সেই একটিমাত্র বীজের , চাপাস্বরে বলে উঠছে - “ তাকে নষ্ট করা যাবে না/ ধ্বংস করা

যাবে না/ না, অসম্ভব/ তাকে খুঁজে পাবে না/ নষ্ট করতে পারবে না/ ধ্বংস করতে পারবে না"। শামশেরের সামগ্রিক কাব্যবিষয় ও শব্দ প্রয়োগে আমরা দেখতে পাই ক্ষুধাকে, ক্ষুধার্তকে নগ্ন করে ভাঁজ খুলে খুলে দেখা, রাগে ঘুষি মারা পৃথিবীর মেকি মুখোশের দিকে। কিন্তু চরম ফতোয়ায় দাঁড়িয়েও ভালোবাসার প্রতি স্নেহের প্রতি একধরনের অবসেশন একধরনের নিরবিচ্ছিন্ন তন্দ্রা রয়ে গেছে শামশেরের । এ সেই অপর পৃথিবী, যেখানে ডেথস ডোরস্টেপ থেকে মিডস অফ লাইফে তার হাত ধরে নিয়ে আসছে শামশেরের মা বা প্রেমিকা। এরা তো সেই বাদল সরকারের "বীজ" নাটকের মেয়েটা যে কিনা একটা 'বাঁচা' কে একটা 'বীজ' কে পাহারা দিচ্ছে লুকিয়ে রাখছে জন্ম- অন্ধ স্রোতের চঞ্চলতা থেকে। যে কিনা বারবার বলছে- " লুকোও ! লুকোও ! লুকিয়ে থাকো। বেরিও না এখন। বাইরে এসো না। ওরা খুঁজছে তোমায় ! ওরা নষ্ট করবে ! ধ্বংস করবে ! " – অন্ধকার থেকে অস্পষ্টতা থেকে শামশেরও কি রোজ রাতে ফিরে আসছেন মা ও প্রেমিকার এক ভাষাহীন জগতে ! আসলে প্রতিটা মানুষই ফেরারি একা সন্ধ্যের কুয়াশার মতো, প্রতিটা মানুষই তার নিজের কাছে উচ্ছিষ্ট, নীরবতা বড়ো হয়ে পড়ে আছে তার জড় ও জাড্য ঘিরে, কবিও এ থেকে আলাদা নন; তিনি হয়ত বোধের কথা বলেন, ইক্ষার কথা বলেন, উন্মেষের কথা বলেন কিংবা শামশেরের মত শূন্যতার সীমাহীন খাদে জীবনের মূল্যবোধগুলির ধ্বংস হওয়ার কথা বলেন অথচ এর পরেও থাকে একটা ফেরা, ভালোবাসার দিকে ফেরা, স্মৃতির দিকে ফেরা ; অবয়বকে আজীবন সংরক্ষণ করতে এভাবেই কি অনিবার্য ও অমোঘ হয়ে ওঠে ভালোবাসার আশ্রয়গুলো ? এই সেই রহস্যময় বেলুন যার কাছে কবি এক লক্ষভষ্ট্র বালক কিংবা ছুটি নষ্ট করে ফিরে আসা কোনো যুবক যিনি বাঁচার সপক্ষে নির্ভরশীলতা খুঁজছেন অনন্যমুখপ্রেক্ষিতা খুঁজছেন। বারবার আত্মিক সংকটে অসুখের টুকরো নিয়ে ফিরে আসছেন সখ্যপিপাসা নিয়ে; শামশের আনোয়ারের কবিতা বেপরোয়া বিসাংনা বিষণ্ন সজীব উদ্দাম আবার তার মধ্যেই যুগমূহুর্তের এক অসাধারন হাহাকার; পরিত্যক্ত হবার ভীতি থেকেই ভালবাসার মত পবিত্র অস্তিত্বের ভেতর প্রবেশ করতে চেয়েছেন শামশের। ভালোবাসার মত মোটা সবুজ ফল জড়িয়ে আত্মনিবিষ্ট অন্ধকার পেরোতে চাইছেন শামশের। এ ভালোবাসা কেবল প্রেম নয় বরং এক নারীর রমনীয় চিকুর কিংবা সবুজ আঁচলের কাছে নির্বোধ হয়ে ওঠা। তাই তো নিঃসঙ্গ বিছানা থেকে শামশের লেখেন-

" আমি যতগুলো কবিতা লিখেছি, তার মধ্যে যেটা
তোমাকে নিয়ে লেখা
প্রায়ই সেটার থুতনি নাড়িয়ে দিই
বিরাট উঁচু স্নেহে আমি হাত বুলোই তার খোলা
ঝাঁকড়া চুলের ওপর
যা সে কখনও আঁচড়ায় না!
তার থুতু এবং লালা ভিজিয়ে দেয় আমার সবটুকু ভিতর
আমি বসে পড়লে সে আমার কোলের ওপর
মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে
বেরুতে চাইলে সজোরে চেপে ধরে আমার প্যান্ট
আমি তার সুন্দর মুখের অর্থ বুঝি না- এমনই ভালোবাসি তাকে
এমনই তাকে নষ্ট করেছি আমি আদর দিয়ে ।". . . . . .

এক আত্মদ্বিখন্ডিত নায়ক, যিনি সাইট্রোনিক সময়ের মাঝে খুঁজে চলেছেন মানুষের সুগন্ধের খসড়াগুলি। আয়ুব যখন রবি ঠাকুরের স্থায়ীভাব প্রসঙ্গে বলেন - " কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না, তবু আকুল প্রাণে কোথা থেকে যেন সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে, বাঁচিয়ে রাখে বেঁচে থাকার- মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার –ইচ্ছাটাকে। "- তখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের প্রেমাস্পদ লক্ষ্য করা যায় তবে তাঁর সেই খোঁজ ছিল পরম সত্তার, দ্য পারফেকট অবজেক্ট অফ এ পারফেক্ট লাভ- এর । আর

শামশের খুঁজে চলেছেন এক নারীকে যে অস্তিত্বের আধোজড়িত ঘুমে শামশের নামের উন্মাদ অস্থির পাখিটিকে স্নেহের প্রশ্রয় দেবে। তবে দেবানুগ্রহে প্রাপ্ত নারীর রূপমুগ্ধতার কাছে নয় বরং রহস্যমুগ্ধতার কাছে আত্মসংবৃত ভিক্ষু হয়ে উঠেছেন শামশের। তাই তো কখনও তাকে বলতে শুনি - " তোমার প্রেতিনীও জীবন্ত মানুষের চেয়ে অনেক সুন্দর যে আমার কাছে" আবার কখনও বা প্রেম হয়ে ওঠে এক মায়াদর্পন; সেখানে কেবল প্রেমিকার আকুতি নয় বরং নারীর নমনীয়ের কাছে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে ওঠে দোমড়ানো মোছড়ানো বোবা ছায়ায় চুরি হয়ে যাওয়া এক কবি; কোনো এক অজানার সাথে আত্মা সংযুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় - "আমি কৃষ্ণ হয়ে নিজেই কেঁদে মরি কৃষ্ণের জন্য!/ আমার বাঁশির শব্দে যে রাধা ছুটে আসে/ সে যে দ্বিতীয় আমি/ আমার ভিতর আমার মায়ের যে কন্যা রয়ে গেছে/ সেই বালিকার সাথে আমি প্রেম করি"- আসলে কার সাথে প্রেম করেছেন শামশের ! কার সাথে প্রেম করেন একজন কবি ! বোধহয় শামশের সেই কবি যার টোটালিটি অফ লাইফে আত্মরক্ষা আর আত্মবেদনা - সমান্তরাল দুই বৈপরীত্যে দাঁড়িয়ে থাকা হাহাকার আর তাঁর কবিতায় উপাচার হয়ে উঠেছে এই 'শঙ্খিল শূন্যতা'। আপাতমৃত্যুর মত অজ্ঞাতবাসের পৃথিবীতে বসে কখনও লিখছেন - "সারাক্ষন আমাকে কিছু একটা চিবোতে হয়/ চিবোতে চিবোতে ফোস্কা পড়ে যায় আমাদের গালে/ জিভে লাল টকটকে ঘা ছড়িয়ে পড়ে/.....সারাক্ষন কিছু একটা চিবোই/ পাকস্থলীর চেয়েও গুরুপাক, হৃদয়ের চেয়ে অনর্গল/একটি কিছু/ আমরা রাগ, লোহা, ধূলো, এবং ঝড়, ছোট ছোট অসফল পাথরগুলি চিবোই/ আমরা কাশতে কাশতে চিবোই ভোটের খবর, মোকদ্দমার ফলাফল বা/ ক্যালেন্ডারে ছুটির দিনগুলো/ এক সময় নড়বড়ে হয়ে ভেঙে যায় আমাদের দাঁত/ আমরা চিবোই দাঁত এবং রক্ত/ আর মানুষ যখন নিজের দাঁত নিজেই চিবোতে থেকে তার চোয়াল/ ও সমস্ত মুখ ভেঙে যায়/ হতভাগ্য মানুষ তখন নিজেরই ঘাড়ের ওপর কয়েকটি রক্ত মাখা,/ ওপড়ানো দাঁত গাঁথা রয়েছে টের পায়- (অনর্গল} "- কিন্তু নিরুপদ্রব শামশেরের কোনো নালিশ নেই। নারীর স্তন সুখের অতল ছুঁয়ে বারবার বাঁধা পড়ছেন সারা রাতের মূক আলপথ ছেড়ে। তাঁর বাঁচার আর্তনাদ মরে যাওয়ার আর্তনাদ কি অনায়াসে মাধুর্য্য দিয়ে বাঁধা পড়েছে এমন তুচ্ছতায়। মরুভূমির লাল ধুলো আর মর্মান্তিক সংগীত পেরিয়ে নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় বসে কবি লেখেন - "বেদনার গুলতি ছিঁড়ে হাঁকি তবুঃ থামো/ শিকল নাড়িয়ে বলি, মীরা, দোর খোলো/ ষড় ঋতু বেদনার শিকল নাড়াই/ চিৎকৃত ক্ষুধায় ডাকিঃ তুমিই আত্মীয় বুক, শাবল ও কঠিন আঁধার/ শরীরের কফিনের ঢাকা খুলে, মীরা, কিছু ওম আর নিবিড়তা দাও।"

"পান্থজনের সখ্য" তে আয়ুব যেমন বলেন ব্যক্তির সত্ত্বার শেষ সম্বলই হল প্রেম এবং তাই সর্বোত্তম মূল্যবান। সেখানে কোনো অধিকারীভেদ নেই, নারীপ্রেম মানবপ্রেম বন্ধুত্ব সখ্যতা যেন এমনই সব অনুপৃথিবী যার মধ্যে অসীমের অনুরণন খুঁজছেন কবি - দ্রষ্টা। জীবনের অর্থ এই সামান্যতম প্রেমে অথচ তার মূল্যের আধার অসামান্য। এই উপলব্ধি শিল্প সাহিত্যের বাইরে স্রষ্ঠাকে নিয়ে চলে সত্যের অন্বেষণে । প্রতীক্ষামাণ করে তোলে। প্রিয়জনের মায়া প্রতিবাদী কবিরও পোশাকের ফিতে কাটে, দেখায় কোন প্রাচীন কুঠি লুকিয়ে আছে শরীরের কোনো প্রাচীন আঁধারে। সেখানে ঘুম আছে স্বেচ্ছায়, স্বেচ্ছায় জেগে ওঠা আছে। ব্যক্তি শামশেরকে চিনিনা তাই তার আত্মাকে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় কিন্তু তার কবিতা থেকে একধরনের রহস্যময়ী মনস্তত্ত্ব সংগ্রহ করা যেতেই পারে। আইডেনটিফাই করা যেতে পারে শামশের আনোয়ারের কবিতার প্রাকশর্তে সংকলিত হয়ে থাকা আপনকে নিয়ে টানাপোড়েনগুলোকে। বিশ্বময় গ্রহণ ও ধারনের তীব্র আওয়াজের পাশে গর্ভের ক্ষীণ শ্রুতির কি তীব্র আয়োজন । বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে উৎপলকুমার বসুর "সাঁতার" কবিতার কয়েক ছত্র - "জল থেকে উঠে আসে জলপোড়া পুরুষের দেহ- প্রকৃত শরীর/ জলের ভিতর থাকে - ওখানেই থেকে যেতে চায়/এই নিয়ে খন্ডযুদ্ধ .....যে শরীর নিশ্চেতন তাকে কেউ জাগাতে পারে না/ যার কোনো আর্তি নেই তাকে আর জাগিয়ে কি লাভ/ সে- ই ভাসে প্রচন্ড সাঁতারে ।"- নিঃসঙ্গ রাস্তার আলো পেরিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো ভেসে যাওয়া পেরিয়ে শামশেরও যেন ওই প্রচন্ড সাঁতারটি ওই প্রকৃত শরীরটি খুঁজেছেন মা ও প্রেয়সী নামের বিবিধ নারীতে। পুরুষ যেমন সময়ের তেজকে নিজের দেহে বিভর্তি বা ধারন করেন তেমনি নারী ধারন করে সেই নিষিক্ত পুরুষকে, পোষন করেন। জড়িয়ে ধরেন তার অন্ন জল আলো বাতাস দিয়ে। তাকে অমৃত নাকি অমরতা কি বলে

আখ্যা দেওয়া যায় তা শনাক্ত করার উপায় না থাকলেও আগুনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা কবির সহনশ্বর হয়ে ওঠে প্রেম নামের নাড়ির বাঁধন। এ এক শীতলতার মায়া, ভিজে কূলের মায়া, যেখান থেকে শামশের বলে ওঠেন-

"প্রেম ছাড়া এ জ্বলন্ত অগ্নিময় শিরশ্চূড়া কে নেভাতে পারবে" ?. . . . . .

_____পাঠ- প্রতিক্রিয়া_____

শব্দের বিবাহ ও তার সাম্প্রতিক পুরোহিতেরা
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

কবিতা শব্দছকের কতটা নিকটচারী ! সেটা বোঝায় না বাজায় ! কতটা আত্মপ্রবঞ্চনা আর কতটা গা- শিরশিরে অনুভবের শিরাজিতে দু'ফোঁটা জীবনরস মিশিয়ে সনাতনী চামচ দিয়ে ঠিক সাতবার গুলিয়ে নিলে প্রস্তুত হয় এই হেমলক ! এ'সব আপাত- নিরীহ, বহুচর্চিত আর কিছু উপেক্ষিত প্রশ্নেরা বিরক্ত করল, বিব্রত করল আর উপশম দিল এ' সময়ের তিনটি উল্লেখযোগ্য কবিতার বই পড়ার অভিজ্ঞতায়।

অভিজ্ঞতা বাটোয়ারা করে নেবো, হে পাঠক! নাকি যাত্রাপথের অনুপুঙ্খ, মেধাবী বর্ণনা দেবো ! অগ্নি রায়ের দ্বিতীয় কবিতার বই 'সূর্যাস্তের সঙ্গদোষ' পড়লে মনে হয় দুটো পন্থাই খোলা। চোখে পড়ে একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে তাঁর কাব্যভাষা নিয়ে নিয়ত চর্চা। ভাষাটি নতুন তো বটেই। বাংলার প্রাজ্ঞ খদ্দরের উপর ক্যাম্পাস-ডায়লেক্টের চকরাবকরা জামাটি অভিনব, সন্দেহ নেই। তবে শুধু ভাষা নয়, অগ্নির কবিতার অভিনবত্ব মূলত কয়েকটি জায়গায়।

প্রথমত, বিষয়ভিত্তিক বাংলা কবিতার পেটেন্ট তিনি ধরে রেখেছেন, বিপণনের প্রথা বা শর্ত ভেঙেও এটাই তাঁর ট্রেডমার্ক। সে' 'মৎস্যপূরাণ'- এর ভেটকি, পাবদা বা শুঁটকি হোক, কিংবা 'ঋতুসংহার'- এর শীত- বসন্ত বা বিস্কুটের কথা—বিষয় থেকে বিষয়ীতে সর্বত্র যাতায়াতের সাবলীলতা। নিছক সাংবাদিকের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েও ব্যক্তি বা বস্তুর আর্থ সামাজিক অবস্থানটির উপর কবিত্বময় আলো ফেলে সঠিক জায়গাটা চিহ্নিত করে দিচ্ছেন তিনি। কখনো শাণিত বিদ্রূপে – 'এই তপশ্রী বার্ণার থেকে সেঁকে নাও রুটি', আবার কখনো যেন হ্যালুসিনেশন বেয়ে সাবলিমিটির দিকে, যেভাবে –- 'ফুটবোর্ডের নশ্বরতা থেকে কয়েকধাপ স্বর্গ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে সিঁড়ি'। আর

এই পথ ধরেই ছেনালিপনা দিয়ে ভুবনায়নের আশ্চর্য সত্যকে আবিস্কার ও স্তব্ধতা – 'তবে, এসব দরিয়াগঞ্জ, মোমিনপুর, গুজরাতের তামাশা কেননা সৌদি আরবের বাটার কুকিজ এতক্ষণে একাকার করে দিয়েছে পেট্রো-পটারির ভুখা বিশ্ব'।

অগ্নির কবিতায় আর একটা চোখে পড়ার মতো বিষয় হল অকপট যৌনবোধ। তাই ভেটকি পাতুরির 'কলাপাতা আর সর্ষের সঙ্গে মাখো মাখো যৌনতার সুতো খুলতে লোভের কাঁচি সদাজাগ্রত থাকে', অথবা কোনো ভান ছাড়াই অনুভব করা যায় 'শুধু এদিক ওদিক হিড়িক/যেন অন্যজন্মের খেলে আসা /ডাঁশা দুটি ক্যাম্বিস বলে/ আদি অনন্তের ভাপ'। এইসব লেখা স্পর্ধাতেই উচ্ছল, ঠিকরে পড়ছে কবিতার গা বেয়ে নামা লাবণ্যের ভিতর থেকে লবণ।

'সূর্যাস্তের সঙ্গদোষ' মূলত শব্দ- নির্ভর কথন হলেও কখনো সে ছুঁতে চেয়েছে ভাষাতীতকে। যা ' বাদামী পাতার পাশে /শোকবাড়ির আত্মীয়ের মত বসে থাকে/- - এই সব কথকতা/ রাজসাক্ষী পাখিদের গাছে জমা থাকে'। সে প্রয়াস সচেতন কিনা জানিনা, কিন্তু সফলও বটে অনেকদূর পর্যন্ত। কবিতার শক্তিশালী বাচন পেয়েছে অর্থপূর্ণ নীরবতা। আর এখানেই নিজের অবস্থানে বিব্রত হবেন সদ্য সদ্য ঔপনিবেশিক হ্যাংওভার কাটানো মেধাবী বাঙালি।

দেবযানী বসুর 'রেডিওঅ্যাকটিভ মিনারেল বৃষ্টি' তাঁর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। শূন্য দশকের পরিচিত স্বরক্ষেপে এ' বই-এর লক্ষ্য 'কবিতামাধবী পানে নতুন ভুবন সৃষ্টি'। মুখবন্ধের ঘোষণাকে মোটামুটি রক্ষা করার প্রয়াস গোটা বইটিতে চোখে পড়ে। একটা নিজস্ব ন্যারাটিভ তো বটেই, নিজস্ব ভুবন গড়ার প্রয়াসও আছে। এ' বইয়ের অসংখ্য কবিতার অবিন্যাসের ভিতর বিন্যাস বা তার বিপরীতক্রম অজস্র সম্ভাবনাময়তার সামনে আনে পাঠককে। এর গহনে থাকে মূলত দুটি প্রকাশ – সভ্যতার ধারণ ও বর্জন। আর এ' দুইয়ের মধ্যবর্তী যাতায়াতে আচমকা সব ব্যাখ্যাতীত চারণভূমি তৈরি হতে থাকে। কখনো বোঝা যায়, কেন 'পরিশুদ্ধ দেয়ালের কাঁধে হাত রেখে নিস্তেজ থার্মোমিটারটি বিষাদ জেনেছে'(চলোর্মিতা), বা 'কেন অধিকরাতের সুপে অনিচ্ছার চামচ নড়ে ওঠে'(কাছে চলে আসে)।কখনো না বোঝায় উপশম—' তাহলেও কারণ বুঝিনি মল্লিকা ও ডেইজিদের বিদায়ী কোলাকুলির', কখনো বা তর্কহীন সিদ্ধান্তে – ' তোমার কথামতো এমন কোনো জায়গা নেই যা বীর্যধারণে অক্ষম'।

কবির মধ্যে নিজের সময়কে আর নিজেকে নিজের মতো চারিয়ে, উল্টে- পাল্টে দেখার, শব্দের অর্থকে পাল্টে দেখার গুঢ় অন্বেষণ কাজ করে। এ' এক অভিসন্ধিও বটে, যা কখনো কখনো নিঃস্পৃহতায় ভরিয়ে তোলে দেবযানীর কবিতাজগত – 'আপেলসূত্র বেয়ে ইচ্ছে খসে পড়ে নিচে। বাতিদন্ড তা কুড়িয়ে নেয়। বাতিদন্ড ভূত হলে তা মেরুদণ্ডে পরিণত হয়'। শুধু 'এফিডেফিটের মাছি', 'ফিনিক্সধর্মী লিঙ্গ' বা 'ডালপালাদের পার্লার' প্রভৃতি শব্দবন্ধ বা বাক্যভাঙা টুকরো একদিকে যেমন চমকপ্রদ, তেমনি পাঠককে ব্যাখ্যাহীন আশ্চর্যের দিকেও নিয়ে যায় কখনো।

কবিতার ক্ষেত্রে, তার চিত্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান জগতের যে 'ক্যালাইডোস্কোপিক ভাঙচুর' চিরপুরাতন কণা গুলি দিয়ে নতুন নক্সা তুলে আনে চোখের সামনে, আর প্রয়োজনমতো মস্তিস্ক দিয়ে তার সমর্থনও আদায় করিয়ে নেয় পাঠকের, সেই ভাঙচুর যথেষ্ট আছে দেবযানী বসুর কবিতায়। বাংলা কবিতায় এটা নতুন না হলেও অসম্ভব উপযোগী এই প্রথা বা প্রকরণের ব্যবহার। কবির কাব্যভাষার ব্যাকরণটাও অনেকটাই উঠে আসে তাঁর নিজেরই অক্ষরমালায় – 'আপনি অন্যমনস্ক হলেন। পংক্তি ভেঙে টুকরোগুলি সিঁড়ি দিয়ে গড়ালো। দুহাতে মুখ থেকে চুল সরালেন যতটা ব্রাকেটে দরকার। দৃশ্যে দৃশ্যে কুশীলব বদলালো। শম থেকে শান্ত ও শমীক হলাম' (ইউবাঁক-২৪) ।

অন্ধকার যেখানে আচ্ছন্ন করে তোলে যাবতীয়, আর গত্যন্তর থাকেনা, তখনই পাঠককে গ্রাস করতে চায় শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তীর কবিতা। কবিকে তো খায়ই, পাঠককেও ডোবায় শব্দের চোরাস্রোতে। শ্রীদর্শিনীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘এসো বৃষ্টি এসো নুন’ পড়লে এই অনুভবেরই কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবেন পাঠক।

কবি শ্রীদর্শিনী নির্মাণে অসম্ভব পটু, আর যেটাই নির্মাণ করেন সেইসব দৃশ্য, আবহ, স্মৃতি, পর্যবেক্ষণ, সুর ও স্বর, আত্মবীক্ষা – সবকিছুই বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আশার ব্যাপার হল, এ’ শক্তি কেবল একটি নিরালা বাতায়নমুখী মৃদু মৃদু ভালো লাগানোর নয় কেবল। অনেক সময়েই তার ভিতর থাকে নাড়ানো চাড়ানোর স্পর্ধাও। সত্যি হয়ে উঠতে চায় কল্পজগত, গল্পজগত – ‘এক ল্যাম্পপোস্ট থেকে অন্যেরা একটু তফাতে/ অনমনীয় বলে, মাঝে আলো ক্রমে কমে আসে’(কিশোরী ও সফেদ ঘোড়ারা) , ‘হিমের অস্তিত্ব আর আকাশের স্থির ঝুলে থাকা’ (চলে যাওয়ার আগে), কিংবা ‘লক্ষ্যভেদ শব্দটার সাথে জড়িয়ে রয়েছে যেই গান গাওয়া পাখিটার চোখ/ সে এই সন্ধ্যের পর অন্ধ হয়ে গেছে মনে হয়’(স্টকার) — এ’রকম নানা উদাহরণ তুলে আনা যায়।

মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের বহুরূপে এই বইয়ে পঙক্তির পর পঙক্তির ঝকঝকে বিন্যাস। কোনো ক্যাওস সিচ্যুয়েশন নেই, উদ্বেগের গন্ধ নেই; উত্তাপ আছে, জারণ- বিজারণে এই বিন্যাসকে শব্দগত করে বুঝে নেওয়া যায়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলশ্রুতিঃ সুডৌল মসৃণ এক কবিতাসফর।

অবশ্য আকৃতিতে গোল মানেই যে প্রকৃতিতে সেই জ্যামিতি ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকবেনা, এমনটা নয়। এ’ কবির লেখাগুলো সম্ভবত সেই জ্যামিতিকেই চ্যালেঞ্জ জানাতে চায় ফর্মের এক সুপ্রাচীন বৃত্তের পরিধির মধ্যেই নানা স্থানাঙ্কে ভ্রাম্যমাণ থেকে। আশির দশকের বাংলা কবিতার এক তথাকথিত লো- প্রোফাইল কবির শিল্পক্ষোভের অনিবার্য ছায়াপাত হয়তো মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবেনা। ছায়া যতক্ষণ না কবির দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে, সে’ ছায়া অস্বস্তির নয়। তাছাড়া সাময়িককে আশ্রয় করে দেশ- কাল ছাড়িয়ে যাবার যে প্রয়াস আমরা নাম না করা পূর্বোক্ত কবির কলম- ছাপানো উচ্চারণে পেয়েছি, শ্রীদর্শিনীর কবিতা কখনোই তার ধারেকাছে যাবার চেষ্টা করেনি।

‘এসো বৃষ্টি এসো নুন’ –এর কবিতাগুলোর থিমবস্তুরা বেশিরভাগ সময়েই প্রেম- অপ্রেম, বিদায়, প্রতীক্ষা, অসুখ ও নিরাময় প্রভৃতি আপাতপেলব ধরণের। তবু, পরিণতিবোধ কোথাও মাঝে মধ্যে মুখোমুখি দাঁড় করায় অপরূপের, জিজ্ঞাসাহীনতার – ‘ নিজেকে টাঙাব বলে/ দেওয়ালে একটা বড় অংশ শূন্য করে রাখি’। এখানেই পরিমিতির মধ্যে থেকেও পরিমাণের স্ফীতকায়তার প্রতি কবির স্মিত হাসি।

***সূর্যাস্তের সঙ্গদোষ, অগ্নি রায়, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৬৪, দাম - ৭৫ টাকা**

***রেডিওঅ্যাকটিভ মিনারেল বৃষ্টি, দেবযানী বসু, কবিতা ক্যাম্পাস, পৃষ্ঠা ১১২, দাম- ১০০ টাকা**

***এসো বৃষ্টি এসো নুন, শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী, সৃষ্টিসুখ, পৃষ্ঠা ৬০, দাম- ৬৯ টাকা**

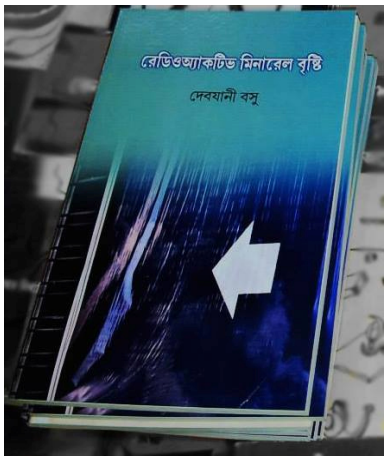

পাঠ- প্রতিক্রিয়া

অনুচ্চার কবিতা ভ্রমণ
মৃণাল বসুচৌধুরী

কবি তানিয়া চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ "কিছু একটার জন্য" হাতে পেয়েছিলাম প্রায় বছরখানেক আগে। বলতে দ্বিধা নেই, এই নামকরণের পেছনে কবির ভাবনচিন্তা যাই হোক না কেন, প্রকাশভঙ্গি আমাকে কৌতুহলী করেছিল। সাধারণভাবে অনেক কবিই হয়ত "একটা কিছুর জন্য" নামটি বেছে নিতেন, কিন্তু তানিয়া "কিছু একটার জন্য" নামটির মধ্যে দিয়েই বোধহয় প্রচলিত ধ্যানধারনাকে একটু সরিয়ে রাখলেন- - - সশব্দে নয়, আলগোছে।

একসময়, ষাটের দশকে "শ্রুতি" আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায়, কবিতা সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা আছে। আমার সেই বিশ্বাস, সেই উপলব্ধি আমায় কবিতা লেখায়। কিন্তু কোনো গোঁড়ামি নেই। আর পাঠক হিসাবে আমি সমস্ত সময় অপেক্ষা করি সেইসব কবিদের জন্য, যাঁরা আমার বিশ্বাসের দূর্গের মধ্যে একটু তোলপাড়, একটু

ভাঙাচোরা করে নিয়ে আসবেন অন্যরকম কবিতা। অদৃশ্য শিকড় ধরে, শব্দ মূর্ছনায় নাড়িয়ে দেবেন আমাদের মেধা ও মনন। কবি তানিয়া চক্রবর্তীকে আমার তেমনই একজন কবি মনে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দু' একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বইটি যখন হাতে পাই, তখনই জেনেছিলাম তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল জুন ২০১১ এ, কবিসম্মেলনে। ঠিক তার দেড় বছর পরেই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। এর আগে, এমন ঘটনা খুব একটা চোখে পড়েনি আমার। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কবিতা প্রকাশ নয়, কবিতার মধ্যে ডুবে থাকাতেই ভালো লাগা তাঁর। কে জানে হয়ত প্রথম কবিতা প্রকাশের অনেক আগে থেকেই এই শব্দশিল্পের সঙ্গে তার গাঁটছড়া ! প্রথম কবিতাতেই তার আভাস পাই কিছুটা

"কিছু দিন স্বার্থ বুঝে নিই
সুসময়ে মোবাইল সুইচ অফ করা
দুঃসময়ে কাতর হয়ে যাওয়া
আর কিছু দিন আমিষ খেয়ে নিই
তারপর সবুজ রং মেখে ঢালাই করব সভ্যতা
একরাতে ঘুম পায়, অন্যরাতে প্রেম
মাঝে যদি কবিতা আসে লেপটে যাই
যাবতীয়কে দূরে ঠেলে পা ধরে অবগাহন শিখি. . . "(সাপুড়ের ইতিহাস)

একটু অন্যরকম অবগাহন শিখতে শিখতে- - - "নদীর দু'ধারে সন্ধি খুঁজতে গিয়ে" তিনি দেখেন "মিথ্যেতে ভরে গ্যাছে বিছানা" আর এক অদ্ভুত বিষণ্নতায় তিনি উপলব্ধি করেন- "সমগ্ররা এখানে গোল গোল ক্যাকটাস" অবাক বিস্ময়ে দেখেন- - "ঋতুহীন গাছের পাশে দাঁড়িয়ে নেই কেউ- - "। এই অবগাহনের সততায় তিনি "ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অন্তর্বাস" দেখে নেন- - - জেনে নেন "প্রজাপতির পূর্বজীবন"। মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলে ওঠেন- - -

"আমার পাশে বসা নকল চাঁদ
তোমার বুকে সুদিন দেখেছিল
ওর বহতা মোহোনায় প্রাপ্তি যোগ করে
মার্জার হতে শিখেছি
খুঁজেছি শিকারীর বিশ্রামের তাঁবু"- - - (সুদিন)

কবির অধিকাংশ কবিতায় উচ্চারণ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর আত্মমগ্ন উপলব্ধির জাত একেবারেই স্বতন্ত্র। মানুষের জীবনযাপন, ঈর্ষা, লোভ, দুঃখকষ্ট, শরীরী প্রেম, যৌনতা, বিষাদ ও আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে তাঁর কবিতায়।

১। ছাই মেখে নদীর পাড়ে বসে আছে প্রেম
কাদায় ভাসে মুখ, নদীর বাঁকে চাঁদের ছবি
ঠিক এইখানে এসে প্রেম অবয়বহীন
ফাঁপা চামড়ার ঢাক থেকে শব্দরা কাঁদে. . . (ধূসর কবিতা)

২। ডেকো না. . .
ডাকলে কেউ খুশি হয়
কেউ বিড়ম্বিত
আর চাপে পড়ে মাটি হয় ভারসাম্যহীন (ডেকো না)

৩। এবার প্রেম করো. . .
প্রেম তোমায় নুনকাটা রহস্য শেখাবে । (রহস্য)

এ রকম সজীব, উজ্জ্বল পংক্তিমালার মধ্যেই সার্থক হয়ে ওঠে তাঁর কবিসত্তা। কিন্তু কবি তানিয়া কি এমন সহজ

সরল আত্মনিষ্ঠ উচ্চারণেই বেঁধে রাখতে চান তাঁর কবিতা ? না বোধহয় ! কবিতায়, নিজেরই তৈরী মায়াবী আবহ তিনি হঠাৎ ভেঙে দেন কিছু ভারী, বিদেশী শব্দ দিয়ে। বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো প্রসঙ্গ, অনায়াসে চলে আসে তাঁর কবিতায়।

কবিতাকে যাঁরা শব্দের শিল্প মনে করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন, শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর মুহূর্তে শব্দের সম্ভাবনা যাচাই করতে হয় কবিকে। সঠিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেই তিনি অর্জন করতে পারেন স্বতন্ত্র ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গী। সেই অর্থে কবি একজন শব্দ- সাধক। কবি তানিয়া চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় প্রায়শই এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যা অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে হয়ত সহজবোধ্য নাও হতে পারে কিন্তু সেই সব শব্দ তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে দেয় এক সপ্রতিভ তির্যক সংবেদনশীলতা। ''অবলিগেটরি'' কবিতার প্রথম স্তবকটির দিকে মুখ ফেরাই- - -

''ধরো, মাংস খেতে ইচ্ছা করছে খুব
অথচ চারিদিকে শুধু সব্জি
খিদের আশ্লেষে তোমাকে সবুজই খেতে হবে
ঠিক এভাবেই প্রতিস্থাপন করো
দেখবে শৈবাল ব্লুম যৌবন দিচ্ছে''

কিংবা ''সিদ্ধিলাভ'' কবিতাটির শেষ অংশ- - -

''...ঈষদুষ্ণ জলে নুন দিয়ে মরা কোষকে ভালোবাসো
ভ্যারিয়েশন বুঝে মাধুকরীর জন্য অপেক্ষা করো
সিদ্ধিলাভ একটা নিছক শব্দের খেলা।''

আবার ''দাগ'' কবিতায় তাঁর উচ্চারণ- - -

''কেউ কেউ বলছে তুমি সৎকার ভালোবাসো
আমি অপরাধ- - - মাঝখানে গেমিউল বেরোয়
নিস্পৃহ তাঁবুতে পড়ে থাকে তির্যক স্পর্শ. . . ''

যেমন অনায়াস তিনি তৈরী করেন ব্যক্তিগত স্বপ্নের আবহ, ঠিক তেমন দক্ষতায় সেই সব ভেঙে দেওয়ার মধ্যেই তার আনন্দ। সামাজিক প্রেক্ষাপট, চতুর্দিকের নৈরাশ্য, জটিল বিষাক্ত পরিবেশ এবং কিছু বৈদ্যুতিন অভ্যাসের মধ্যেই জীবনযাপন আমাদের। আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় আত্মস্থ করি আমাদের অভিজ্ঞতা । কবি তানিয়া চক্রবর্তীর কাব্যচেতনার জন্মও তার পারিপার্শ্বিক জগত থেকে উপলব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার মধ্যে বেড়ে উঠলেও তাঁর কবিতায় এক পরিশুদ্ধ মননের মুখোমুখি হই আমরা- - -

''ভেজা চোখের পাশ দিয়ে
জন্মাচ্ছে পাথরকুচির জননশিল্প
বিছিন্ন পাওয়ায় কালো হয়ে উঠছে ফিলামেন্ট
সমস্ত আলো শোষণ করে নিচ্ছে মীমাংসা
মৃত্যুকালীন বাল্ব কেটে যাচ্ছে
কর্কট এসে কোষ খাচ্ছে'' - - - (ফিলামেন্ট)

প্রেমহীন, সিদ্ধান্তবিহীন পরিক্রমায় ''কালপুরুষের ফাঁদ'' এড়িয়ে ''আতিথেয়তার হাড়িকাঠে'' মাথা রাখবার আগে নিষ্পাপ তার উচ্চারণ- - -

''পিন্ডের ধারণা করি, এসো
পিন্ডের পূর্বযোনি আমার একমাত্র বাসস্থান''- - - (পরিণতি)

সঠিক শব্দ ব্যবহারে কোথাও কোথাও তাঁর চিত্রভাষায় অনুপম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছি - - -

''চাঁদের গলনকাহিনি বলেনি কেউ
শুধু বলেছে পুরুষটি ময়াল সাপের বংশধর

এক একটা নক্ষত্র চুরি করে সে সাজিয়েছে চোখ
ক্রমশ আলোরা প্রতারক হয়ে গেছে''- - - (পুরুষটি)
এমন শব্দ নিয়ে আঁকা অনেক ছবি ছড়িয়ে আছে তাঁর কাব্যগ্রন্থে। সহৃদয় পাঠক এইসব শব্দ- ছবি যে নামেই তাদের অভিহিত করুন না কেন ঔজ্জ্বলতা অম্লান থাকবে তানিয়ার কাব্যজীবনে। এই প্রসঙ্গে T. S. ELI OT – এর একটি উক্তির সূত্র মনে পড়ছে - - - শুধুমাত্র সত্যের প্রকাশ নয়, কবির উপলব্ধ সত্যকে বাস্তবের তুলনায় আরো অধিকতর সত্য করে তোলাই কবির কাজ। দৃশ্যমান সত্যকে বোধ বা চৈতন্যর রং, খড়, মাটি দিয়ে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন কবি, তাঁর সৃষ্টির মাধুর্যে এটাই কাম্য। তানিয়ার কবিতাগুলো পড়তে পড়তে মনে হল তিনি ঠিক পথেই হাঁটছেন।

যে প্রয়োজনীয় কথাটি শুরুতেই বলা উচিত ছিল সেটা বলেই শেষ করবো- - - আমি নিজে কবিতা লিখি। কারো কবিতার সমালোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। কিছু কিছু সর্বজ্ঞ সমালোচকদের মতো ক্ষুরধার মননশক্তি থাকলে হয়ত তানিয়ার কবিতার কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাই বলতাম বেশি। পারিনি। আমার এই অক্ষমতায় আমি লজ্জিত নই । কেননা, আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে নতুন প্রজন্মের একজন কবিকে বোঝার চেষ্টা করেছি মাত্র। কিছুটা পেরেছি, যেটুকু পারিনি সেটুকু আমি আমার কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছি । দেখেছি তাঁর প্রজ্ঞাশাসিত শব্দমিছিলে কবিতার আলোকিত আনন্দযাত্রা। অনির্বচনীয় আনন্দে সার্থক হয়েছে আমার ''কবিতা- ভ্রমণ''। আনন্দপাঠ।

***কিছু একটার জন্য, তানিয়া চক্রবর্তী, পাঠক প্রকাশনী, প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, মূল্য- ৪০ টাকা**

সূর্যাস্ত ও মনোরম হত্যাদৃশ্য
সৌমেন বসু

কিছু কিছু কবিতা বহির্মুখী। উৎসবের হাওয়ার মত ভেসে বেড়ায় হেমন্তের জঙ্গলে, পাহাড়ের ঢালে, শহরের আলো ঝলমলে রাস্তায়। আবার কিছু কবিতা খুব অন্তর্মুখী। চুপ বসে থাকে ছায়াময় ঘরের কোণে। মিশে যায় শরীরের রক্তে, খোঁজে এক অদ্ভূত নির্লিপ্তি। থাকে প্রশ্ন, সন্দেহ, হা হা বাতাস। "গোয়েন্দার আকাশ" বইটির অধিকাংশ উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের। দু- তিনটি ছাড়া সব কবিতাতেই একধরনের নিরাপত্তাহীনতা ভেসে বেড়ায়, যা আমাদের সমকালীন জীবনের অংশ। আরো আছে চোরা সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের সংকেত কবিতাগুলির ভাঁজে ভাঁজে। মালার্মের কাব্যধারনা যে কথা বলে, সংকেত অনুসরন্ করে পাঠক কবিতার রহস্যময়তায় পৌঁছে যায়। "তখনি চমকে ওঠে বিদ্যুৎ চোরকুঠুরিতে. . ./আয়না খুঁজি, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাকাই, আঙুলের জলবিন্দু চুষি. . . (ভয়) ।

সমকাল কে কবিতায় জায়গা করে দেওয়া কোনো এজেন্ডা হতে পারেনা। একটি সচেতন কবিতায় চারপাশের ছায়া এমনিই এসে পরে। "তাসের প্যাকেট থেকে জোকারের উৎকর্ণ উঁকি, বুঝি দিন শেষ হলো /বাইপাসের ধারে, প্রেমিক- প্রেমিকা বসে কবিতা শিখছে, চায়ের দোকান . . . " (গল্পের ভিতর দিয়ে)। জীবনের নশ্বরতা আজ আর একমাত্র বিষয় নয়, যাপনের ভাঙ্গন সর্বনাশ ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আজকাল। "গাছের সর্বোচ্চ ডাল থেকে, লক্ষ্য করি আমাদেরই গুঢ় বেঁচে থাকা /আঘাতে, অন্ধকারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে চলে, সন্ধ্যার পরেই। এবং সকালে"(পরিদর্শন) ।

পুরো বইটাতে অমিতাভ একটানা নেশাছন্ন এক প্রবহমান ধ্বনি কে নিয়ে চলেছেন। যদিও তা অন্তর্লোকে আলোকিত এবং উজ্জ্বল সময়স্রোতে ভাসমান। উচ্চকিত নয়, নম্র উচ্চারনে অমিতাভ লেখেন, "এই রাত, এই মৃদু কষ্টের ধারণা, যাকে শব্দের শিরায় গেঁথে /প্রতিটি অক্ষর থেকে রমণীয় রক্তপাত হবে. . .!!" (রমণীয় বেদনাগুলি)। শব্দ ব্যবহারে তেমন সচেষ্ট হতে হয়না অমিতাভকে, তার শব্দভান্ডার সাবেকি - প্রয়োগে যুক্তিগতভাবে আধুনিক। মূলত টানা গদ্যে লেখা কবিতাগুলোর ভিতরে একটা সুর আছে, একটা মনকেমন উৎকন্ঠা ও অপেক্ষার সুর। ভ্লাদিমির আর এস্ত্রাগনের মত এই অন্তহীন অপেক্ষা যেন একটি মধুর যন্ত্রণার মত। বইটা পড়া শেষ হলেও মাথায় একটা রেশ রয়ে যাই। অমিতাভর ভাষা বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের অনুসারী। এবং তার কবিতাগুলির সাথে সম্পৃক্ত। নতুন কিছু হয়ত কবিতাগুলোর সাথে বেমানান হয়ে যেত।

***গোয়েন্দার আকাশ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ভাষালিপি, প্রকাশ - কলকাতা বইমেলা, ২০১৪, মূল্য - ৬০ টাকা**

আমাদের ওয়েব ম্যাগাজিন শূন্যকাল সম্পর্কে আপনার মতামত জানান

আপনার নাম

ইমেল

মোবাইল

মতামত

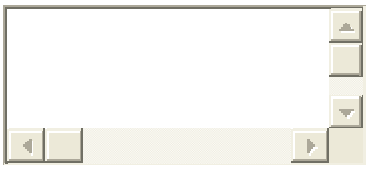

গত সংখ্যার পাঠ-

প্রতিক্রিয়া

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় : দেবযানী বসু, তানিয়া চক্রবর্তী, ঋষি সৌরক, রঞ্জন মৈত্র, পীযুষ বিশ্বাস - এদের কবিতা আর সাথে অলংকরণ মনে দাগ রেখে গেল।

অনুপম মুখোপাধ্যায় : এই ব্লগজিনের নাম 'শূন্যকাল'। আমার ধারণা এই সংখ্যাটি এই সময়ের বাংলা কবিতার দলিল, ইস্তাহার। যারা লিখেছেন, তাঁদের বাদ দিলে এই সময়ের বাংলা কবিতার শুধু খোলটুকু পড়ে থাকে, তাও ফাটা। লজ্জার সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আপনাদের মতামত জানতে চাই। শুধু আমার লেখা পড়তে হলে স্ক্রল করে নিচে নামতে হবে একটু। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলছি, সকলের লেখা পড়ুন। প্লিজ পড়ুন।

অনুপম মুখোপাধ্যায় : একটাও বাজে লেখা নেই!!!!! কাব্যডায়েরির ধারণাটা অভিনব। চালিয়ে গেলে একটা নতুন জঁরের সূচনা হতে পারে। কবির দিনলিপির চেয়ে আর কোথায় থাকে বলুন না কবিতার সম্ভাবনাগুলো! দুই কবিই বেশ অন্যরকম লিখেছেন। বিশেষ করে তানিয়া। আমি তো ওর কাছে এরকম লেখাই এবার প্রত্যাশা করব। পাবো কিনা জানি না। নিচের কবিতাগুলো আবার একটু অন্যরকম তানিয়া। কিপ ইট আপ। মলয়দাকে নিয়ে কী আর বলি! পুরুষের কবিতা কতরকমভাবে বিচ্ছুরিত হতে পারে, তাঁর সাম্প্রতিক পর্বের কবিতাগুলো তার উদাহরণ হতে পারে। বারীনদা স্বমহিমায়। সকলের কবিতা নিয়েই বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এত স্ক্রল করে করে বারবার দেখতে হবে, যে কমেন্ট করাটা চাপের। শুধু জানাই, অন্তর্নির্জনের কবিতা দুর্দান্ত লাগল। ওর কবিতার শেষ পংক্তিগুলো আবিষ্কার হয়ে আসে। এর মহিমা কলম্বাস বুঝতেন, বা আমেরিগো ভেসপুচি। পীযুষকান্তি আর নভেরা একই গন্তব্যে রওনা হয়েছেন, নভেরা পৌঁছতে পেরেছেন সফলভাবে। ভাস্বতী মনেপ্রাণে নতুন কবিতা লিখছেন। সিয়ামুল হায়াত সৈকত এখানে একটু বেমানান। কবিতাটা মধুর। ইন্দ্র... ফাটাফাটি ভাই। রমিতের কবিতা নিয়ে আমার কিছু অভিযোগ থাকত। সেটা অন্যের কবিতায় ওর যথেচ্ছ গমনাগমন নিয়ে। এই কবিতাগুলোয় দেখলাম, ও নিজের ভাষায় লিখেছে। সেটা আশ্বস্ত করল। এগুলো হাততালি পাবে কম, কিন্তু ওর নিজের স্বাক্ষর বহন করবে, সেটাই জরুরি। কিন্তু গদ্যের ব্যাপারে ওর সতর্ক হওয়া দরকার। বন্ধু হিসেবেই বলছি। পাঠক হিসেবেও। ওর শব্দচয়নে অটোমেটিক রাইটিং- এর আশংকা জাগে আমার মনে। আমার যদি খুব ভুল না হয়, এই ভাষা গদ্যের হতে পারে না। কবিতা ক্ষেত্রে কোনো কিছু বলার নেই, কবিতায় একজন মানুষের সঙ্গে একজন মানুষের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপার থাকে... তুমি আমার ভাষা বুঝলে কি বুঝলে না আমার বয়ে গেল। কিন্তু প্রবন্ধে একজন মানুষ সমাজের সঙ্গে কথা বলে। খুব সহজে গভীরতার বদলে অন্তঃসারশূন্যতার মুখোমুখি হতে পারে। ' মৃত্যু মানে সেখানে কেবল মৌনতা হতে পারেনা, হতে পারেনা একটা ল্যাজ উঁচোনো ছুটন্ত কাঠবেড়ালীর মত তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাওয়া জীবন থেকে ন্যাড়া বটতলা রেখে মানুষের বিশাল গর্জন রেখে। এর পরেও যা থাকে তা কোনো চিৎকার নয় কোনো নৈঃশব্দ্যতা নয় বরং একটা গোঙানী। একটি আদর্শ গোঙানী যা শেষমেশ স্বীকৃত জীবনের মূল্যবোধ দাবী করে। যা শেষ পর্যন্ত ধুতে চায় শ্রমজ ভোরের ফেনা কিংবা শুধতে চায় শ্মশানবন্ধুর কাঠের দেনা!' ... এই শ্রুতিমধুর উচ্চারণ সেখানে অচল পয়সা মাত্র। অনুবাদের গুরুত্ব একটি কবিতা পত্রিকায় অসম্ভব। আমি

নিজে অনুবাদকে কত গুরুত্ব দিই, 'বাক'- এর পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। নাওদেও- এর আরো কিছু কবিতা আমি পড়তে চাইব। জ্যাকসন ম্যাক লৌ- এর জন্য অনেক স্তুতি রইল, কারণ এটা আমাকে কিছু কবিতার উসকানি দিল। সকলের লেখা নিয়েই বিস্তারে আবোল তাবোল বকতাম আর বলতাম যদি লেখাগুলো আলাদা আলাদা উইন্ডোতে খুলত। সকলের জন্য একেকটা পেজ বরাদ্দ করা যায় না, প্রিয় সম্পাদককে ভেবে দেখার আর্জি রইল।

Gourab Chakraborty : Payeli Dhar amake obak kore dilo! eta jeno 1ta notun abiskar! oneker theke valo laglo ei Notun Kobir lekha (ontoto tulonamulok kichhu porichito torun-torunir lekha theke)... Swapan da Otulonio! Barin da, Nilabja da, Debjani dir KabyoDiary chomotkar! Debadrita valo likhchhe! Malay dar lekhata amar byaktigoto vabe NITE ektu osubidhei holo (ei byapare no comment)! Ramit da or lekhay Manibhushan ke arekta punorjonmo diye dilo... khub valo laga lekha! Uma da khub norom r omogh sahityer bishuddho amej poribeshon korechhe sondeho nei... Sabyasachi Hajra dinedine 1ta porinoto jadukor hoye jacche! khub tene rakhlo amay! notunder modhye jara hothat jonoprio hoye jachchhe... tara kivabe hochchhe bujhte osubidha hoy... ekhono tader lekhay sei orthe swotontro swor onuposthit! eta sahityer khetre moteo itibachok noy! ojotha Boroder prosongsay tader lekhar khoti hochchhe bole mone korchhi... onektai dhaar-kora sworer mayay achchhonno laglo!

ঋষি সৌরক : কবিতাগুলোর নির্বাচন এবং ব্যাপ্তিকরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে । যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যমে তৈরী একটি বাংলা ওয়েবম্যাগ - কড়া এবং ভালো

Madhuchhanda Mitra Ghosh : Dipankar da -------- just kono katha hobe na. sunnokal dekhe amar katha just bondho hoe gechhe dip da. amar sob theke bhalo legechhe ---- proti ti lekhar sathe oi sob photography collection. khub bhalo laglo Shunyakaal.

Pradip Chakraborty : tomar samogrikh bhabnar sukkhota ar monograhi prasongikh chobir nandonik bebohar bes najor kara....kaaj gulo theke jaoar moto...

Sk Saddam Hossain : First of all i will just say "Outstanding".... i truely impressed by your Shunyakaal webzine... best of luck ....

ভায়লা সালিনা লিজা : একটু অন্য ধাঁচের কবিতাগুলো। কিছু সরলতা জটিলতা সব মিলিয়ে কবিতা গুলোর মান এতো উন্নত যে মতামত জানাতেও ভয় হচ্ছে। খুব ভালো লাগলো মলয় দাদার লিখটা কারনিভোরনি পড়ে। ভালো লাগলো কবিতার অনুষঙ্গে ছুবিগুলো। অনেক শুভ কামনা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

ইন্দ্রনীল বক্সী : বেশ কিছু ঝাঁজালো লেখা নিয়ে উপস্থিত 'শূন্যকাল' । এক একটা পত্রিকার এক এক রকম গন্ধ আমার কাছে । 'শূন্যকাল' পড়লে একটা জ্বালা ধরানো গন্ধ টের পাই । আলাদা করে কোনো লেখা নিয়ে বলছিনা । 'কাব্যডায়েরী' ব্যাপারটা বেশ লাগে । নিজের লেখা নিয়ে মতামত পেলে ভালো লাগতো ...পড়ছি. . .

রেবা সরকার : পায়েলী ধরের কবিতা পড়লাম ভালো লাগলো বেশ .....অন্যদের পড়া বাকি..... সময় করে পড়ব।

জপমালা ঘোষরায় : কাব্যডায়েরি একটা অভিনব ভাবনা দীপঙ্কর তোমাকে আমি পরামর্শ দেবো নেওয়া না নেওয়া তোমার ব্যাপার। এই বিভাগটা প্রত্যেক সংখ্যায় রাখার এবং নতুন নতুন তিন- চার জনকে লিখতে অনুরোধ করার। তাহলে বিচারটা সহজ হবে। যেহেতু প্রকরণটা নতুন এবং লেখক নতুন লিখছেন সেদিক থেকে ভালো। তবে রবি ঠাকুরের কবিতা আর নাটকের মধ্যে যে তুলনা সেই তুল্যমূল্য বিচারে তানিয়াকে বলবো কাব্যডায়েরি লেখাটাকে আরো একটু ঋদ্ধ করতে হবে। শূন্যকাল জুন সংখ্যা আমার কাছে একটা অত্যন্ত সাজানো কম্প্যাক্ট লোভনীয় পত্রিকা হয়েছে। ঋদ্ধ রচনার পাশাপাশি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছবিগুলো সম্পাদকের এক ভিন্ন সংবেদনের পরিচয় দিচ্ছে।

মৃণাল বসুচৌধুরী : খুব সুন্দর লাগলো তানিয়ার লেখাটি। অভিনন্দন তানিয়া।

নভেরা হোসেন : কবি অগ্নি রায়ের প্রলাপ নামচা পড়ছিলাম। একটা সাইকো শক এর মতো হলো। লেখার যে একটা স্টেরিওটাইপ ধারা তার থেকে অনেক ভিন্ন জায়গায় অগ্নির চলাচল। এটা চিন্তার ক্ষেত্রে এবং ভাষা থ্রোয়িং এর মধ্যেও আছে। টমেটো আর পেঁয়াজ কুচিরা উত্তরাধুনিক ঢাল তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত। কুসুমের আলো জল রঙে সন্তরণশীল। অগ্নি ডায়েরি একটা নতুন ভাষায় লেখা। আরও পড়তে পাব নিশ্চয়ই । কনগ্রেটস।

প্রদীপ চক্রবর্তী : পুরো পত্রিকা'টা পড়ে ভাললাগার অনেক খোরাক পেলাম... ভালোলাগার তারতম্য নিয়ে মৌন এবং মুখরতা তাদের আড্ডা জমায়... এটা চলে যেটা হয়তো যে কোনও পত্রিকার প্রাণ শক্তি ... তবে অন্যের ওপর নিজের মতামত কেউ কেউ চিরকালই আরোপ করেন... ব্যাপারটা কেও sportingly নেন এবং উদাসীন হয়ে উপেক্ষা করেন... কেও আবার টপ করে গিলে ফেলে , তার মুল্যবান সময় ব্যয় করেন অনেক আবেগ তাড়িত প্রতিক্রিয়া দিতে দিতে...। কেও পুরোটাই উপভোগ করেন আড়ালে থেকে... এ 'ভাবেই পত্রিকার প্রাণ শক্তি বাড়তে থাকে ক্রমে ক্রমে... শূন্যকালে এ 'সব যখন ঠিক ঠাক চলছে তখন বুঝতে হবে পাঠকের রসনা বেশ তৃপ্ত ... এই সাফল্যের রসায়ন যিনি মেশাচ্ছেন, সেই দীপঙ্করের, কবিতার মেজাজ অনুযায়ী ছবির ব্যবহার তারিফ করার মতো ... আর এই ওয়েবে - মাধ্যমের সব চেয়ে পরিচিত মুখগুলোর কয়েকজন এখানেও তাদের পরিশ্রমী মতামত রাখছেন অন্য অন্য সব ক্ষেত্রের মতো দেখে আহ্লাদে আট খানা হয়ে যাচ্ছি ... তাদের মুখরতার সঙ্গে পত্রিকার দুর্দান্ত প্রকাশের ককটেলকে মিশিয়ে আবার একবার বলছি রে ভাই.....চিয়ার্স . . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

কাজল সেন : একথা আর উল্লেখ করা বাহুল্য যে, 'শূন্যকাল' আমার অত্যন্ত প্রিয় ওয়েব ম্যাগাজিন। এবং এজন্য আমি দীপঙ্করের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এখন জামশেদপুরের বাইরে আছি কিছুদিন। পুনাতে এসেছি। ফেসবুকে ঢোকার সুযোগ কমই হয়। কিন্তু আজ ফেসবুক খুলে 'শূন্যকাল'এর ষষ্ঠ সংখ্যা দেখে উল্লসিত হলাম এবং প্রথমেই পড়ে ফেললাম তানিয়া চক্রবর্তী ও রমিত দে'র লেখা। দুটো লেখাই আমার অসাধারণ লাগল। তানিয়া খুব কম দিনই হলো লেখা শুরু করেছে। বয়সও নিতান্তই কম। কিন্তু ওর লেখা কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। তানিয়ার কবিতা ভাবনা, শব্দ চয়ন, চিত্রকল্প নির্মাণ, উপস্থাপনা আমাকে আকর্ষণ করে। এবং আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তানিয়ার সাহস ও তার কলমের জোর। আমি আরও লক্ষ্য করছি, ইদানীং সময়ে যেসব তরুণতর ছেলে মেয়েরা সাহিত্যের কলম হাতে তুলে নিয়েছে, তাদের কলম খুবই শক্তিশালী এবং দক্ষতাও যথেষ্ট। আমি তাদের ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি। রমিত ভালো কবি এবং প্রাবন্ধিক। আমি রমিতের লেখার ভক্ত। এত পড়াশোনা করে, পরিশ্রম করে কোনো বিষয়ের ওপর রমিত তার ভাবনা ও বিশ্লেষণ যেভাবে ব্যক্ত করে, এক কথায় বলতে হয়, সেই লেখাগুলি অনবদ্য। রমিত এই সংখ্যায় আমার অত্যন্ত প্রিয় কবি প্রয়াত মণিভূষণ ভট্টাচার্যের ওপর যে লেখাটি পরিবেশন করেছে, তা আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মণিদার স্নেহলাভে ধন্য হয়েছি। বিশেষত আমরা যারা সত্তরের দশকের আন্দোলনের উত্তাপে নিজেদের ঋদ্ধ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, মণিদার কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি আমরা সবাই । রমিত তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, মণিদার ওপর তুমি একটি সুন্দর

লেখা আমাদের উপহার দিয়েছ। বাকি লেখাগুলি এখনও পড়া হয়নি। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত, প্রতিটি লেখাই আমাকে আরও কিছুটা শিক্ষিত করে তুলবে। দীপঙ্কর, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

উমাপদ কর : শূন্যকাল- ৬ অনেকটাই পড়া হল। বিশেষত তিন জনের কবিতা- ডায়েরি। তিনটি লেখাই বেশ ভাল লাগল। পত্রিকা পরিবেশন ও খুব সুন্দর। দীপঙ্কর যেভাবে এটি সাজায় আর ছবি যোগ করে তা অতুলনীয়। অনেক পরিচিত কবির ভালো উৎপাদনগুলো পেলাম এখানে। মন ভালো হয়ে যায়। ধন্যবাদ দীপঙ্কর।

সিয়ামুল হায়াত সৈকত : একেকটি লেখা অসাধারণ। আর স্থিরচিত্রগুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য। ধন্যবাদ অসাধারণ সংখ্যাটির জন্য॥

বেবী সাউ : বাহ! দুর্দান্ত ম্যাগাজিন টি। সারাটি দুপুর মুগ্ধ করে রাখলো। অসাধারণ কবিতা গুলো আর রমিতদার প্রবন্ধ নিয়ে তো কিছু বলার থাকে না . . .

স্বপন রায় : কাজ তো দারুণ হচ্ছে! চালিয়ে যাও ভাই! তবে পড়তে সময় লাগছে অনেক, ইউজার ফ্রেন্ডলি করার চেষ্টা করো। শুভেচ্ছা রইলো!

ঝর্না বিশ্বাস : সাইটটির সাথে আজ প্রথম পরিচয়...খুব ভালো লাগল...কাব্যডায়েরি বিভাগটি আলাদা করে বলতে হয়...প্রতিটা লেখাই দারুন...পড়লাম বেশ কিছু কবিতাও...বিজ্ঞান ও কবিতা কিভাবে মিলেমিশে আছে তার প্রমান আছে এখানেও...প্রচুর শুভেচ্ছা রইল. . .

ঋজু ঘোষ : আমি বলি খুবই ভাল লাগল এপর্যন্ত যতগুলো পড়লাম। যদি লেখকের নামগুলি ক্লিক করে তাঁদের লেখা পড়া যেত তাহলে খুবই ভাল হোত। সোনায় সোহাগা এক্কেবারে।

অচেনা অতিথি : প্রিয় শূন্যকাল, কোন এক কারনে আপনাদের ব্লগটি পরিদর্শন করতে ঢুকে পড়েছিলাম। আপনার এবং আপনাদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সত্যি সার্থক। কিছুটা সময় নষ্ট করে অসন্তুষ্ট হইনি। প্রত্যেক কে আমার শুভেচ্ছা রইলো।

Pranab K Chakraborty : Chhobir sanjojan magazine-ke atotai garjanshil kore tulechhe, astittwer purush sattwa ke ghosito kare. Manibhusan & Namdeo Dhamai-ke lekha duti samayer kachhe daybaddhatar suchak. Manibhushan-ke niye Ramit de-r kaaj jatnaomoy, avinandan. Kobita, ato chhinnyo abasare ato govir manojogi pathher sujog dichhe na, khosha chhariye ros bar korte samay lagbe bistar. Prayash dirgha jiban pak. Sundar and it's nice.

Jinat Islam : Bhao laglo Gourob chakroborty o Sajal Das er kobita. lekhagulor nirbachon khub atristic way te hoechhe. kaj ta moulik.

প্রবীর রায় : কাব্যডায়েরীর ধারনাটি বেশ ।কবিরও স্বাধীনতা থাকে আর পাঠকও কবির অনুভবকে পান রোজনামচায়। কবিতা অংশটা শেষ করতেই তো অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু কবি নিরবাচন, বারীন ঘোষাল থেকে শুরু করে অস্তনির্জন প্রবীন নবীনে ,মন ভরিয়ে দিল। রমিত দের লেখা মনিভূষণের মৃত্যু চেতনা আবার পড়তে হবে। লেখাটা আমায় টানছে।

উৎপল ত্রিবেদী : বাস্তবিক ভাল লেগেছে। অন্যান্য ওয়েব কাগজের মান দেখে একটু সন্দিহান ছিলাম, তবে স্বীকার করি সন্দেহ কেটে গেছে। আন্তরিক অভিনন্দন। কবিতা সমস্ত না হলেও বেশির ভাগ ভাল লেগেছে। অধিকাংশই নব্বই বা শুন্য দশকের কবি মনে হল। আমাদের সমসাময়িক, সত্তর দশকের প্রতিনিধিত্ব পেলাম না। পরে নিশ্চয় পাব। মনিদাকে নিয়ে লেখাটা বেশ ভাল। প্রিয় মানুষ, কাছের মানুষ অনেকে চলে গেলেন বছর শুরুর সাথে সাথে। মনিদা, নামদেও ধসাল, গল্পকার- নাট্যকার অসীম ত্রিবেদী, কবি প্রভাত চক্রবর্তী। এই হারিয়ে ফেলার মধ্যে আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া এই চমৎকার উপহার উজ্জীবিত রাখবে।

নীতা বিশ্বাস : একটি দারুন বলিষ্ঠ ওয়েব ম্যাগাজিন। শূন্য দশকের। কাব্যডায়েরি'র দেবযানী বসু ও তানিয়া চক্রবর্তী দারুণভাবে মন কেড়ে নিয়েছে অসামাণ্য গদ্যে। বারীনদা যা সাজেস্ট করেছেন তার সাথে আমিও একমত। কবিতা প'রে জানাচ্ছি। শুভেচ্ছা।

অলোক বিশ্বাস : আজ শূন্যকালের কাব্যডায়েরিগুলো পড়লাম। মন ভরে গেল। দেবযানী, তানিয়া, অগ্নি আমাকে মাতিয়ে দিয়েছে। তানিয়ার এত ভালো লেখা আগে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। আমাদের নিরন্তর কবিতা নিয়ে কথা ও আড্ডার কারণে এতসব ভালো কবিতার নির্মাণ। আর পায়েলি ধর পাগলের মতো লিখেছে। প্রতিক্রিয়া চলতা রহেগা।

মিলন চ্যাটার্জী : পড়লাম । রিকের 'হোটেল কোলকাতা' ভালো বেশ, অগ্নি রায়ও বেশ, আরও কিছু লেখা ভালো লেগেছে । কবিতার সম্পর্কে বলার জায়গায় আসিনি এখনও । স্পষ্টত কিছু সূক্ষ্ম ফারাক তো অনুভুতির থাকেই, সে জায়গা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক । কবি কাকে বলে ? কবিতা কাকে বলে ? আর কেউ লিখতে জানেন কিনা - - সবই আপেক্ষিক । তবে অনুপমদার লেখা নিয়ে অনেকটাই মগজরন্ধ্রস্থিত করেছি আলাপে, বাকি যেটা কাল মনে হয়েছে সেটা সাক্ষাতে বলব, আলোচনা হবে । সব্বাইকে শুভেচ্ছা

শ্যাম পুলক : ভাল লাগলো। লেখা গুলো বিভিন্ন ধরনের স্বাদ আছে। অদ্ভুদ কিছু কল্পলোক আছে। আমার ভাল লাগে এমন . . . . . .

গৌতমেন্দু রায় : পায়েলী ধরের "এবং রূপকথারা" . . . Fantastic

টোকন মান্না : কবিতাগুলো ভালো . . . . . .

Bhaswati Goswami : Shunyakaal aamader kanthaswar.....an attitude....kudos to Dipankar....aklanto bhabe shanito kore tulchhe contemporary kobita...shorik hote pere aamra aanondito

ঝুমা চট্যোপাধ্যায় : আঁতকে ওঠার মত ।

সঞ্জীব নিয়োগী : অসাধারণ অনুবাদ করেছেন দিলীপ ফৌজদার, জ্যাকসন ম্যাক লৌ - র কবিতা। "আসলে তিনি মুখস্থ করে নিচ্ছেন একটি অস্তিত্ব যা নিশিথ গরাদ বেঁকিয়ে ক্রমাগত বেড়িয়ে পড়তে চাইছে একটা মৃত গ্রহের ডায়রেক্টারি থেকে। সেখানে মৃত্যুর বাইরেও মহাবিশ্বের শেষ পরিণাম দেখতে ইতিহাসের চওড়া রাস্তা ধরে বেড়িয়ে পড়েছে কালহীন মানহীন মাত্রাহীন মৌন মানুষগুলো।" রমিত দে কে পড়তে ভালো লাগে। অসম্ভব মেধা পাই প্রদীপ চক্রবর্তী আর অনুপম মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়।

Moynee Mukherjee : apnar webzine patrika ti porlam valo laglo.